দৈনিক সংবাদ

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন
কেন্দ্র

10 JUL 1990
24

পরীক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তন

বাংলাদেশে বিভিন্ন বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা বর্তমানে এক বিরাট প্রহসনে পরিণত হয়েছে। এই মূল্যায়নটা শুধু আমাদের বা অভিভাবকদের নয়। ডঃ মফিজউদ্দীন আহমেদের নেতৃত্বে কিছুকাল আগে যে জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয় তাদের প্রতিবেদনেও বলা হয়েছে—"বাংলাদেশে যেকোন পরীক্ষাই বর্তমানে প্রায় প্রহসনে পরিণত হয়েছে।" এই প্রহসনের প্রধান কারণ হচ্ছে পরীক্ষায় ব্যাপকাকারে নকল যা গণটোকাটুকির পর্যায়ে উপনীত হয়েছে।

পরীক্ষার উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীর মান যাচাই করা। কিন্তু এক্ষেত্রে ব্যাপক অসদুপায় অবলম্বনের কারণে এখন ফল দেখে পরীক্ষার্থীদের মেধা নিরূপণ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

এ কারণেই দাবী উত্থাপিত হয় পরীক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তন করার এবং এই প্রেক্ষাপটেই পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের ধরন বদলানোর সুপারিশ করা হয়।

আমাদের দেশে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষাগুলোতে এখনো মূলতঃ রচনাধর্মী প্রশ্ন করা হয়। এটা শুধু নকলকেই প্রশ্রয় দিচ্ছে না, অধিকন্তু এতে অনেকে শুধু মুখস্থ বিদ্যায় 'পণ্ডিত' হচ্ছে। তোতা পাখীর মত প্রশ্নোত্তর মুখস্থ করে হয়ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া যায়; কিন্তু তা বিষয়টি ভালভাবে বুঝবার নিশ্চয়তা দেয় না।

রচনাধর্মী প্রশ্নের পাশাপাশি ছোট ছোট নৈর্ব্যক্তিক (অবজেকটিভ) প্রশ্ন করলে ছাত্র-ছাত্রীরা গোটা কয়েক সম্ভাব্য প্রশ্নের উত্তর তৈরীর পরিবর্তে গোটা বই তথা পাঠ্যসূচী পড়তে বাধ্য হবে। তাদের জ্ঞানের পরিধি বাড়বে। সর্বোপরি শিক্ষায় জাতীয় ব্যাধি নকলের সুযোগ অনেকাংশে কমবে।

এই বিবেচনায় ১৯৯২ সাল থেকে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় এবং ১৯৯৪ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় নতুন পদ্ধতিতে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের অর্থাৎ শতকরা ৫০ নম্বরের নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন রাখার যে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে তা ফলদায়ক হতে পারে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে উল্লেখিত সময়ে নতুন পরীক্ষা পদ্ধতি বাস্তবায়িত হবে কিনা। কাজের অগ্রগতি বা অগ্রগতির অভাব এক্ষেত্রে অনিশ্চয়তার সৃষ্টি করে রেখেছে।

পাকিস্তান আমল থেকে বিভিন্ন শিক্ষা কমিশন পরীক্ষা সংস্কারের যেসব সুপারিশ করে তাতে অনেক আগেই নতুন পদ্ধতি চালু হবার কথা ছিল। ১৯৫৯ সালের শরীফ শিক্ষা কমিশন, স্বাধীনতার পরে কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন, ১৯৭৮ সালের জাতীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদ, ১৯৮২ সালের ডঃ মজহারুল হকের নেতৃত্বে গঠিত টাস্ক ফোর্স, ১৯৮৫ সালের অধ্যাপক শামসুল হকের নেতৃত্বে গঠিত জাতীয় পরীক্ষা উন্নয়ন কমিটি এবং ১৯৮৭ সালে ডঃ মফিজউদ্দিন আহমেদকে প্রধান করে গঠিত জাতীয় শিক্ষা কমিশনসহ সকলেই পরীক্ষা পদ্ধতি বদলাবার সুপারিশ করেন।

টাস্ক ফোর্সের সুপারিশ অনুযায়ী ১৯৮৫ সাল থেকেই নতুন পদ্ধতি চালুর কথা ছিল। সেক্ষেত্রে পরিবর্তিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী এর বাস্তবায়ন ৭ বছর পিছিয়ে গেছে। এখন ১৯৯২ সালেও তা বাস্তবায়ন করতে না পারলে তার কোন কৈফিয়ত থাকবে না।

১৯৯২ সালের লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের জন্য এ বছরের অষ্টম শ্রেণীর বার্ষিক স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় নতুন পদ্ধতি চালু করার কথা। এজন্য সরকার গঠিত টাস্ক ফোর্স নৈর্ব্যক্তিক কৃতিত্ব অভীক্ষার ৫শ মডেল প্রশ্নের সেটের একাংশ স্কুলগুলোতে ইতিমধ্যে পাঠিয়েও দিয়েছেন। কিন্তু রচনাধর্মী প্রশ্নমালার মডেল তৈরীর কাজ হাতে নিতে বিলম্ব কেন তার উত্তর পাওয়া যায়নি। সময়মত রচনাধর্মী প্রশ্নের মডেল তৈরী করে স্কুলগুলোতে সরবরাহ করতে না পারলে ১৮ লাখ টাকা খরচ করে যে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নমালার সেট তৈরী করা হয়েছে সেগুলোকে যথাযথভাবে কাজে লাগানো যাবে না এবং চলতি বছরের অষ্টম শ্রেণীর পরীক্ষায় নতুন পদ্ধতি চালু করা যাবে না। পরিণামে '৯২ সালে এসএসসি পরীক্ষায় নতুন পদ্ধতি চালু করাও অসম্ভব হয়ে পড়তে পারে।

তাই আমরা আশা করব, কর্তৃপক্ষ জরুরী ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন, যাতে নতুন পরীক্ষা পদ্ধতি ৭ বছর বিলম্বে বাস্তবায়নের যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছেন অন্ততঃ সেটি বাস্তবায়িত হয়। এ ব্যাপারে অধিকতর বিলম্ব করা আত্মঘাতী হবে।

তবে যে কোন প্রকারের নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন করলেই যে পরীক্ষায় নকল পুরোপুরি বন্ধ হবে একথা নিশ্চিত করে বলা যায় না। ইতিমধ্যে কয়েকটি উচ্চতর পরীক্ষায় নৈর্ব্যক্তিক ধরনের প্রশ্নপত্র তৈরী করে পরীক্ষা নেয়া হয়েছে। দেখা গেছে, প্রশ্নের নম্বর উল্লেখ করে সহায়তাকারীদের মাধ্যমে নকলবাজরা নকল করেছে। সেজন্য প্রশ্ন একই রেখে প্রশ্নের নম্বর ভিন্ন করায় অর্থাৎ একই পরীক্ষাকক্ষে ভিন্ন ভিন্ন সেটের প্রশ্নপত্র সরবরাহ করার সুপারিশ করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ এক সেটে কোন প্রশ্নের নম্বর রয়েছে যেখানে ৭ সেখানে অন্য সেটে সেই একই প্রশ্নের নম্বর হবে ২৩ কিংবা ৩১। তৃতীয় সেটে এর নম্বর হবে অন্য কোন। সোজা কথা নতুন পদ্ধতিটা যতটা সম্ভব নকলের সুযোগমুক্ত হয় সে ব্যবস্থা করতে হবে।

052